বাংলাদেশের উর্দূভাষী ও বিহারীরা

মখদুম আজম মাশরাফী

নেসার আমার বাল্যবন্ধু। ওর বড় ভাই সগীর আমার বড়ভাইয়ের বন্ধু। ওর বাবা একজন অমায়িক ধর্মপ্রাণ মানুষ। ওরা ৫ ভাই। এদের চামড়ার ব্যবসা। নেসারের কাছে জেনেছি তার দাদু এসেছিলেন বিহারের কাঠিহার থেকে। উর্দূ মাতৃভাষা হলেও, আমাদের উপস্থিতিতে বাড়ীতে এরা বাংলা বলতো। ডোমার নীলফামারী জেলার শেষ থানা। সীমান্তবর্তী। আমাদের লাগোয়া পশ্চিম বাংলার কুচবিহার জেলার হলদিবাড়ী থানা। আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় অনর্গল স্বাচ্ছন্দে কথা বলতে পারতো এরা সবাই। শুদ্ধ বাংলাতো জানতোই। কিন্তু সগীর ভাই 'শালাকে' 'ছালা', 'সবাই আসিস' কে বলতো 'ছবাই আছিস'। কিন্তু তিনি নিজে ভাবতেন তিনি পুরোপুরি শুদ্ধ বলছেন। যাহোক, তিনি নিজের ছোট ভাইয়ের মত আমাদের স্নেহ করতেন। নেসারের বাবা সদাপ্রফুল্ল মানুষ ছিলেন। স্কুল জীবনে যতবারই ওদের বাড়ীতে গিয়েছি অনেক আদর পেতাম।

স্কুলে আমাদের স্কাউট ও 'কাব' চর্চা হতো পুরো দমে। আমাদের স্কাউট দলে শুধু বিহারী নেসার নয়, হরিজন বা মেথর পরিবারের ছাত্র রাজকুমারও ছিল। বড় হয়ে ডোমারের বাইরে এসে পৃথিবীর ধর্ম বর্ণ জাতপাতের বৈষম্য দেখে ভাবতেই পারিনি আমাদের ছেলেবেলা ছিল কত নির্মল। আমাদের গ্রাম-জীবন ছিল কত উদার আর মুক্ত মনের। আহা সারা পৃথিবীর সমাজ যদি হত আমার ছোট্ট গ্রাম-জীবনের মত। সবার ছেলেবেলার বন্ধু থাকে। নেসার তাদের মধ্যে একজন। ও মাঝে মাঝে বলতো ওদের পূর্ব পুরুষদের কথা। শুনে ভালো লাগতো। তখন পাকিস্তান। স্কুলের পরিবেশে কোনদিন ভাবিনি, কার মার্তৃভাষা ভিন্ন, কার ধর্ম ভিন্ন। আমার স্কুলের বন্ধুদের সহৃদয় সান্নিধ্যের কথা যাদের স্মৃতি মিষ্টি মধুর বেদনার মত বাজে তার মধ্যে নেসার, রমেশ, সমশের, হরিহর, পুষ্পজিত, আশরাফ, মুক্তা, রাজা এদের নাম অক্ষয় হয়ে আছে।

আমাদের স্কাউট গ্রুপে নেসারও ছিল। আমরা জেলা বিভাগ ও জাতীয় স্কাউট সমাবেশে ও জাম্বুরীতে যোগ দিয়েছি বহুবার। সে দিনগুলি ছিল আনন্দে, উদ্দীপনায় ভরপুর। পরে বড় হয়ে যখন জেনেছি মানুষে মানুষে ভেদাভেদের ব্যাপারগুলি তখন মনে হতো আমাদের গ্রাম জীবনের নির্মলতায় যে পঙ্ক নেই, বাইরে থেকে তা এনে কলুষিত করা হয় আমাদের জীবন যাত্রা। যেমন সেনবাড়ীর ছেলে ভঞ্চু, অতুল, মেয়ে দেবযানী, যাকে বুড়ি বলে ডাকতাম সবাই, ওরা আমার ছেলেবেলার সাথী। একদিন হঠাৎ করে এরা চলে গেল ওপার বাংলায়। মনে আছে রাতে ঘুমোতে পারিনি। বালিশ ভিজে গেছে চোখের জলে। ভেবেছি ওরা আমার কে? ওরা কি আমার আত্মিয়? না তবে? যেন আত্মিয়ের চেয়ে বেশী।

আমাদের ডোমার এখন পৌর-উপজেলা বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের শেষ লোকালয়। এটি আগে থেকেই সমৃদ্ধ বাণিজ্য স্থান। এখানে আমার বন্ধুদের মধ্যে আরও আছে লিম্বু, লিচিয়া,

সান্তিয়া। এরা মাড়োয়াড়ী। এরা কিন্তু চলে যায়নি ভারতে। শত প্রতিকুলতায়ও এরা আছে। ৬৫ সালের যুদ্ধের সময় আয়ুব খান কিছু মাড়োয়াড়ীকে দেশছাড়া করেছিলেন ওরা জন্মগত পূর্ব পাকিস্তানী নয় বলে। সেই একই ব্যাপার ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া ভেদাভেদ আমাদের মমতাবন্ধনের জাল ছিড়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে অনেককে। তছনছ করেছে সাজাণো বাগান।

এখন নীলফামারী জেলার অন্তর্গত সৈয়দপুর উত্তর অঞ্চলের ভিন্নরকম জনপদ। এখানে আছে ইংরেজ আমল থেকে এশিয়ার সবচেয়ে বড় রেলওয়ে কারখানা। এই কারখানাটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শ্রমজীবি মানুষের এক কর্মচঞ্চল জীবন যাত্রা। প্রধানতঃ ভূমি নির্ভর বাংলাভাষাভাষি হিন্দু-মুসলমান কৃষিজীবিদের এ অঞ্চল সৈয়দপুর, একটি বিশিষ্ট দ্বীপের মত। কারন রেলওয়ে শ্রমজীবিদের মধ্যে বেশী সংখ্যকই হচ্ছেন উর্দুভাষী। পাশের রাজ্য বিহার থেকে এরা এসেছেন ১৯৪৭ সনে। শ্রমিক ছাড়াও এই উপজেলা শহরটি বিবর্তিত হয়েছে একটি মিনি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল টাউনে। কারন সৈয়দপুরে কারিগরী ভিত্তিক সবই তৈরী হত বৃহত্তর সাধারণ মানুষের জীবন চারণের জন্যে যা প্রয়োজন। যেমন বালতি, বাগানে পানি দেয়ার জন্যে ঝরনার মত পাত্র ইত্যাদি। আরও ছিল তোষক, বালিশ, সাবানের ফ্যাক্টরী ইত্যাদি। ছিল অনেক কাপড়ের দোকান। অনেক রকমারী সুস্বাদু খাবারের দোকান, রেষ্টুরেন্ট বা খাবারের হোটেল। মনে আছে যখন রংপুরে মেডিকেলে পড়তাম বাড়ী ফেরার পথে আমার বাবার জন্যে বিশেষ ধরনের মিষ্টি নিতে কখনও ভুলতাম না। আব্বা মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন খুব। আব্বা আমার শৈশবে আমাকে মিষ্টি খাওয়াতেন পেটপুরে। দিনাজপুর কাচারী এলাকায় ছিল অনেক মিষ্টির দোকান। পানতোয়া, রাজভোগ, চমচম, রসগোল্লা, ছানার সন্দেশ, নারিকেলের লাড্ডু, ছানার জিলাপী, অমৃতি। সেই স্মৃতি আমাকে সহসা আপ্লুত করেছে আজীবন। তাই আব্বার বৃদ্ধ বয়সে আমি সেই স্নেহধন্য সময়ের কিছুটা প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিহারীদের বর্তমান মানবেতর দিনকাল

ছোটবেলা থেকে দেখেছি সৈয়দপুর ছিল ডোমারের মানুষের শপিং করার জায়গা। ব্রডগ্যাজ লাইনে রাজশাহী খুলনা থেকে ট্রেন আসতো ডোমারে, শেষ সীমান্ত ষ্টেশন চিলাহাটি পর্যন্ত। চিলাহাটির ওপার বাংলায় কুচবিহার জেলার হলদিবাড়ী থানা। সকালের ট্রেনে আমরা যেতাম সৈয়দপুর বাজার ঘাট করতে। শার্ট আমরা কিনতাম না। তখন গার্মেন্ট ইন্ডাষ্ট্রি বলে কিছু গড়ে ওঠেনি তখন। পরে ৭২-৭৩ সালে ঢাকায় লেখাপড়া করতে গিয়ে দেখেছি 'রিয়াজ গার্মেন্টস্' নামে শার্ট তৈরীর একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেটিও ছিল বিহারীদের। টু-বাই-টু লায়ালপুরের উৎকৃষ্ট সূতি শার্টের কাপড় ছিল ২ টাকা থেকে ৩ টাকা গজ। প্যান্ট বা ট্রাউজারের জন্যে পিস

কাপড় কিনতাম সৈয়দপুর থেকে। প্রধানত জাপানী ট্রেন। সৈয়দপুরে ছিল দক্ষ দর্জীর অনেক দোকান। ওরা খুবই সুন্দর করে পোষাক বানাতো। লুঙ্গি, গামছা, শাড়ী, বিছানার চাদর, সাবান সহ সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনাকাটা করতাম সৈয়দপুরে। সবশেষে সিনেমা দেখা। দুটি সিনেমা হলে দেখতাম প্রধানত উর্দু ছবি। কখনও কখনও বাংলা।

আরও ছিল মহরমের পর্ব। সৈয়দপুরের উর্দুভাষীদের মধ্যেছিল শিয়া মুসলিমদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা। নানারকম তাজিয়া তৈরী হত অনেক। মর্শিয়া হত। লাঠিখেলা দেখা ছিল অন্যতম আকর্ষন। নানান কসরত ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড হত। তিনকোনা লম্বা, লাল-নীল, সবুজ, হলুদ পতাকায় সাজতো সৈয়দপুর। শোভা যাত্রা হত ছোট পুরো শহরের রাস্তা ধরে। আমরা সারা রাত ধরে তা উপভোগ করতাম । পরদিন সকালের ট্রেনে চেপে ঢুলু ঢুলু বাড়ী ফিরতাম। আমরা কোন বছরই তা মিস করতাম না। দল বেঁধে যেতাম তা উপভোগ করতে। সারা দিনরাত চলতো সে উৎসব। মেলা বসতো রাস্তার ধারে ধারে। বাঁশী, বেলুন, কতরকমের খেলনা, মাটির তৈরী উজ্জল রং করা ফলের সমাহার, ঘোড়া, হাতি, পাখি, হাঁস এসব কেনা যেতো। ছোট্ট একতারা। শব্দকরে চলে এরকম টানার গাড়ী। নাচের জন্যে বিশেষ রকমের সঙ পুতুল পাওয়া যেতো। রাস্তার ধারে ধারে বসতো লেহেড়ীর দোকান। বড় তামা অথবা পিতলের হাড়িতে চুলোয় গরম হতে থাকতো্ সেই সুস্বাদু খাবার। লেহেরী হলো গরুর হাঁড়ের তৈরী একধরনের স্যুপ। উত্তরবঙ্গের কুয়াশা ছাওয়া শীতরাতে উৎসব আর লেহেড়ী তপ্ত করে রাখতো নির্ঘুম আনন্দময় মূহুর্তগুলোকে।

এইসব ছিল সৈয়দপুরের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। যদিও তা ছিল একান্ত সৈয়দপুরের উর্দুভাষী মানুষের জীবন চালচিত্র বৃহত্তর বাংলাভাষী হিন্দু-মুসলমান কেউই কখনও আলাদা বা দুরত্ববোধ করেনি। যেন সৈয়দপুর ভৌগলিক অবস্থানে একটু দূরে হলেও, হয়ে উঠেছিল আমাদের একান্ত অন্তর্গত জীবনের অংশ। এই লোকালয়ে স্বভাবতঃই পরিচয় গড়ে উঠেছে নানান মানুষের সাথে। জীবনের দৈনন্দিন চর্চায় যারা হয়ে ওঠে আপন তারাইতো জীবনের অংশ। রাজনীতি, ক্ষমতা, জাতি-বোধ, ইতিহাস নানাভাবে ভিন্নতা খোঁজে মানুষের মধ্যে। খুটিয়ে খুটিয়ে খোঁজে অমিলগুলি। কিন্তু প্রকৃতির সহজ জীবনচারণের নিয়মে যে মিলগুলি, যে বন্ধনগুলি গড়ে ওঠে তার মূল্য যে অনেক। তাকে অস্বীকার করবার যে কোন প্রবনতা, প্রয়াস কেবল ছিন্নতন্ত্রীর ব্যথাকেই উসকে দেয়। জীবন-উৎসব হয়ে ওঠে সংঘর্ষ আর জীবন-আনন্দ হয়ে পড়ে বিষন্নতা। কিন্তু আমার যতো মধুর স্মৃতি তা তো মিল ও বন্ধনের সুনির্মল সহজাত সেই সোনা রঙ দিনগুলি। আর যত নিরানন্দ আর বিষন্নতার শীতল ছায়া তো আজ-কাল-পরশুর জীবন।

ডোমারের রেলষ্টেশনের পাশেই আমাদের বাড়ী। বাজারও রেলষ্টেশনের ধার ঘেষে। কৃষক, গৃহীরা দুধ বিক্রী করতো মাটির পাত্রে, রেল লাইনের ওপরে বসে। বিকেল-সন্ধ্যায়, আমাদের সময় যাপনের জায়গাও ছিল শালকী নদীর ওপর রেলের ছোট্ট পুলের ওপর। পুলের দুপাশে ছিল ইটবাঁধানো থানের মত। যেখানে বসে আমরা বন্ধুরা উপভোগ করেছি কত পড়ন্ত

বিকেলের সোনরোদ, অস্তরাগ আর গোধূলি বেলায় মন কেমন করা কাল। বন্ধুদের কে উর্দুভাষী, কে কোন ধর্মের এ রকম কোন বৈষম্যই আমাদের স্পর্শ করেনি।

বড়দের মধ্যে ছিলেন সালাউদ্দিন ভাই আমার এক বড় ভাইয়ের বন্ধু, আসগরদা, পরে যিনি আমার এক একটু দূর সম্পর্কীয় চাচাতো বোনের সূত্রে দুলাভাই হয়েছিলেন। ওয়ালিয়ার রহমান যিনি ছিলেন আমার চাচার চীনা বামপন্থী দলের ছাত্র সংগঠনের একজন। পরে অবশ্য তার প্রতিক্রিয়াশীল ক্রিয়াকলাপ সবাইকে বিস্মিত আর ক্ষুন্ন করেছিল। আখতার ছিল আমাদের বন্ধু শ্রেনীর। ওর দর্জীর দোকান ছিল বাজারে।

বাজারের মোড়ে বিনোদ দে'র ব্যবসা আড়তের নীচে এক সারী মুচির দোকান ছিল যা এখনও তেমনিই আছে। বিনোদ আগারওয়ালা আমার জুনিয়র কিন্তু বন্ধু শ্রেনীর। এরা পশ্চিমা এক বিশেষ ভাষায় কথা বলে, বাংলা ছাড়াও। প্রসাদ দা ছিল আমার বড় ভায়ের, যিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তার সহপাঠি। এখন সময় পাল্টেছে কিন্তু রাস্তার পাশে বসে সেই একসারি মুচিদের পেশা ও কাজ অব্যহত রয়েছে। আমাদের বাড়ীর লাগোয়া বালিকা স্কুলের পুকুরের ওধারে এখনও আছে মেথরদের পরিবার। ডোমারের তিনটি হিন্দু মিষ্টির দোকানের পেছনে রেললাইনের ধারে মাটিতে বসে এরা চা খেতো ওদের নিজস্ব ভান্ডে। এখনও তা তেমনি আছে।

বাংলাদেশে আটকে পড়া বিহারীদের বিক্ষোভ আন্দোলন

আমাদের ছেলেবেলার সবচেয়ে প্রিয় মনিহারি দোকান ছিল 'হালিম ভাইয়ের' দোকান। না হাসলেও হাসিমুখ হালিম ভাই শিশু কিশোরদের খুব ভালবাসতেন। নানান রকম স্কুল সামগ্রি, কাগজ কলম, খাতা পেন্সিল, মেয়েদের প্রসাধনি, ফীতা, আলতা চুড়ি, আতর পাওয়া যেতো এই দোকানে। তার আঁধোউর্দু , আঁধো বাংলার মিষ্টি -সহাস্য কণ্ঠস্বর এখনও আমার কানে বাজে। আর ছিল লাখনার ঝুরি বুন্দিয়ার দোকান। লক্ষন ছিল 'পশ্চিমা' ডাইলেক্ট এর চা এবং টা এর ছোট্ট দোকানের মালিক বাজারের মধ্যখানে। হাটের মতো। আমাদের বন্ধুদের প্রায় সন্ধ্যায় 'চা হাউস' ছিল লাখনার দোকান। গণেশের ছিল ঝাল বড়া আর মিষ্টি গোলগাপ্পার দোকান। বাজার করে বাঁচানো একআনা দু'আনার কিনতাম ঝালবড়া। তখন এক'আনায় পাওয়া যেতো বড় বড় চারটি ঝালবড়া। অথবা ছোট ছোট ছ'টি।সেই গরম তেলে সদ্য ভাজা ঝালবড়া আর গণেশের প্রশান্ত মুখ কোনদিন ভুলবার নয়।

ওর নাম ছিল রমজান। যখন প্রাইমারী স্কুলে তখন আমার বড় ভাই নিয়ে যেতো রমজানের সেলুনে চুল কাটাতে। চেয়ারে হাতলে একটি বিশেষ পিড়ির আসনে বসাতো আমাকে রমজান,

ছোট বলে। সেই থেকে যতদিন ডোমারে ছিলাম রমজান ছিল আমাদের পারিবারিক নাপিত। কাঁচির অদ্ভুদ ছন্দ তুলে চুল কেটে চলতো রমজান। আর অপেক্ষমান গ্রাহকদের সঙ্গে চলতো নানান বিষয়ে গল্প। জীবনে জীবন্ত চালচিত্র আর কি। জীবন এখনকার মত 'প্রোফেশনাল' জীবন নির্লিপ্ত অথচ অস্থির। কৃত্রিম নিয়ম নির্ভর ছিলনা। জীবনের ছিল সমীরনের মত অথবা স্বচ্ছতোয়া নদীর মত স্বতস্ফুর্ত বহতা গতি। টেনশন বা স্ট্রেস্ এসব শব্দের কোন ব্যবহার ছিলনা। ছিল স্বতস্ফুর্ত আনন্দময় জীবন স্রোত। রমজান 'শ' কে 'ছ' বলতো বলে আমার ছিল হাজারো প্রশ্ন। ছেলেবেলায় আম্মাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি শুধু হাঁসতেন।

হাই স্কুলে যখন এলাম তখন পেলাম আমীর হামজাকে। সুরমা চোখে মেহেদী রাঙ্গানো দাঁড়ীতে এক বিশিষ্টতা ছিল ওর। ওকে প্রিয় লাগতো এই জন্যে যে শেষ বেলায় ও বাজাতো ছুটির ঘন্টাটি। আর আমাদের কে পায়। হাফ প্যাডেলে সাইকেল চালিয়ে পৌঁছে যেতাম বাড়ী। আমীর হামজাও ছিল উর্দূভাষী। থাকতো প্রায় দশবিঘা জমির উপর যে স্কুল তার এককোনে স্বপরিবারে ছোট্ট নীড় বেঁধে। যেন স্কুলই ছিল তার জীবনের দশদিগন্তের সীমানা। বিকেলে স্কুলের মাঠে যখন ক্রিকেট কিংবা ফুটবল খেলতে যেতাম, এসে বসে থাকতো আম গাছটির তলায়। গান ধরতো, "আঁখ কা নজর কম হোনেছে কাজল দেকে কেয়া ফায়দা"। পরে জেনেছি এটি সেই প্রখ্যাত বাংলা গানটির তার নিজের করা অনুবাদ।

রেলের ঘুমটিওয়ালা ছিলেন ইউনুস ভাইয়ের বাবা। নিয়মে কোন ব্যত্যয় হত না। সন্ধ্যা হলে রেলষ্টেশনে বড় বড় ল্যাম্পে আলো জ্বালাতেন তিনি। তারপর প্ল্যাটফরমের লাইট পোষ্ট গুলো- যেগুলোতে ইংরেজ আমলে গ্যাস লাইট ছিল- সেখানে মই বেয়ে উঠে জ্বালাতেন কেরোসিনের শিখা। তারপর রেল লাইন ধরে হেটে যেতেন আউট সিগনেলের আলো জ্বালাতে। তিনি কথা বিশেষ বলতেন না। যেন যন্ত্রবত কাজ করে যেতেন আপন নিয়মে। ষ্টেশন ঘরে বহু পুরোনো আমলের টেলিফোন ছিল। এক অংশ কানে আর অন্য আলাদা একটি অংশ মুখে উর্দুতে কথা বলতেন আগের বা পরের ষ্টেশনের সঙ্গে। তারপর ঘট ঘট শব্দ করে রেখে দিতেন ফোন। পাশেই প্ল্যাটফরমের ওপর দোতলা ঘুমটি ঘরটি। বড় লিভারের মত সব সারি সারি লাইন পরিবর্তনের হ্যান্ডেল। লাল, সবুজ রঙের। সে সব দঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে ভাল লাগত। মনে হত তার কত না ক্ষমতা। যখন যুদ্ধ শেষ হল ইউনুস ভাই আর তার বাবা চলে গেলেন পাকিস্তানে। জানিনা তারা ডোমারকে এ দেশকে ভুলতে পেরেছে কিনা তাদের নতুন দেশে।

ষ্টেশনের পাশেই চামড়ার আড়ত আর বাড়ী মুজিবুল দা'দের। যখন তিনি স্কুলে মুহিবুল দা ভাল ক্রিকেট খেলতেন। তিনি বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চলে গেলেন এমেরিকায়। তিনি এখন নাসায় কাজ করেন শুনেছি। তার ছোট বোন ভাল রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন। পরে মজিবুলদা'র বড় ভাই এর শ্যালক মাসুদ ঢাকা কলেজে ছিল আমার সহপাঠি। মাসুদ ছিল খুব বন্ধু বৎসল। ডোমারে এলেই আমাদের বাড়ীতে আসতো। এখন দেশে কোথাও প্র্যাকটিস করে। ওর বাড়ী পার্বতীপুরে। মুজিবুলদার কথায় বোঝার উপায় নেই যে তার মাতৃভাষা উর্দু, মাসুদও তাই।

আমার চাচার ছিল গালা মালের আড়ত। সৈয়দপুর থেকে কাপড় কাঁচা সাবানের এজেন্সি নিয়েছিলেন তিনি। 'রোজাদ্দিন সোপ ফ্যাক্টরীর' প্রতিনিধি হয়ে আসতেন, তাকে আমরা সবাই বলতাম মঈনুদ্দিন চাচা। আমার আব্বার তিন ভাইয়ের তিনটি বাড়ীর একটি গুচ্ছে প্রায় ২০ জনের মত ভাই বোন ছিলাম। তিনি আমাদের জন্যে মিষ্টি বা চকলেট আনতে কখনও ভুলতেন না। সৈয়দপুরে তার বাড়ীতে অতিথি হয়েও গিয়েছি ছেলেবেলায়।

আমাদের এই গুচ্ছ তিনটি পরিবারের তিনটি বাড়ীর প্রায় দশ বিঘা জমির ওপর। বাড়ী সংলগ্ন চারটি পুকুর ও সবজি চাষের জমি। আমার বাবা তার ভাই বোনদের বড় তার পরবর্ত্তী ভাইয়ের বাড়ীর আঙ্গিনার আরেক প্রান্তে ছিল বিহারী চাচা ও চাচীদের ছোট ঘর। চাচার নাম শুনিনি কখনও। লাল ভাই ও লালী ভাই ছিলেন তাদের দুটি ছেলে । ওরা ছিলেন আমাদের বড় ভাইয়ের মত। এদের বাবা ছিলেন পরহেজগার মানুষ। চাচী তাওয়ায় রুটি বা চাপাতি বানাতেন এমন করে যে তাওয়ায় তা বেলুনের মত ফুলে উঠত। তারপর চাচী তা আঙ্গুল দিয়ে দুটি স্তর আলাদা করে ফেলতেন। ছেলেবেলায় এও ছিল এক দক্ষ শিল্প বিস্ময় আমার কচি মনে। এরা ছিলেন নিভৃতচারী, নিরিহ বিস্ময় আমার কচি মনে। এরা ছিলেন নিভৃতচারী, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। খুব আদর করতেন আমাদের সবাইকে। বাংলা ও উর্দুভাষার মিশ্রণে এদের ভাষা ছিল মজাদার।

অন্য উর্দুভাষী যাদের সান্নিধ্য ছিল আমার শৈশব-বাল্য-কৈশরের প্রাত্যহিক অংশ তারা হল বুড়ো আইসক্রিম ওয়ালা, তিলের খাজা, সনপাপড়ি, বুড়ির চুল (ক্যান্ডি ফ্রস), চিনি বাদাম ওয়ালারা। সৈয়দপুর থেকে এরা সকালের ট্রেনে আসতেন সারাদিন সেই বিরাট ভার কাঁধে করে ফেরি করতেন বাজারে, স্কুলে গ্রাম গ্রামান্তরে। সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে যেতেন সৈয়দপুর। ছেলেবেলা এদের উপস্থিতি, আসা-যাওয়া ছিল অবিচ্ছিন্ন আনন্দময় অংশ।

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পঃ অষ্ট্রেলিয়া

লেখার বাকি অংশ আগামী সংখ্যায় প্রচার করা হবে। দৃষ্টি রাখুন কর্ণফুলী'র সাম্পানে।